ত্রৈমাসিক পত্রিকা

উদ্যানপালন বার্তা

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪

উপকারী আর অর্থকরী, প্রকৃতি দু'য়েই কার্যকরী

মুখ্য সম্পাদকের কলমে

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—ছয়টি ঋতুর বৈচিত্র্যের সমাহারে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্ভার। প্রতিটি বিদায়ী ঋতু যেমন কিছু স্মৃতিতে জড়িয়ে রেখে যায় তেমনি নতুন আগত ঋতুটির সাথেও জড়িয়ে থাকে কিছু প্রত্যাশা, কিছু অতীত অভিজ্ঞতা।

আমাদের পত্রিকা সংখ্যার প্রতিটি পর্বে আমাদের চেষ্টা থাকে আগত প্রাকৃতিক ঋতুটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিছু প্রতিবেদন তুলে ধরার। তাই এবারের প্রতিবেদনে আমাদের পাঠকবন্ধুদের জন্য সাজানো রইল ফুল, ফল ও সব্জী ভরা এক সুদৃশ্য ডালি যেগুলি আগত গ্রীষ্মে আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে ছুঁয়ে যেতে পারে।

আপনাদের ভালো লাগা হয়ে উঠুক আমদের আগামীদিনের চলার পথ।

আসন্ন নতুন বাংলা বছর ১৪৩১-এ সবার সুস্থতা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির শুভ কামনা রইলো।

পরিমিতা

বরিষ্ঠ উপ-সচিব
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তরের ত্রৈমাসিক পত্রিকা

উদ্যানপালন বার্তা

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	প্রাপ্তি	পৃষ্ঠা নং
মুখ্য সম্পাদকের কলমে		
প্রচ্ছদ নিবন্ধ		২
• জবা ফুল-এক অর্থকরী ফুল	অপর্ণা সরকার, (ADH, পশ্চিম মেদিনীপুর)	৪-৫
• ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ফুল চাষ-এক নজরে	সুপ্রতীক মৈত্র, (ADH, উত্তর ২৪ পরগনা)	৬-৭
• লাভজনক ভাবে হলুদ তরমুজ চাষ	ডঃ সমরেন্দ্রনাথ খাঁড়া (DDH, সদর দপ্তর)	৮-৯
• ড্রাগন ফল—উপকারী ও অর্থকরী	জয়া বর্মন, (ADH H.R.D.F., তাল ডাংরা, বাঁকুড়া)	১০-১২
• মাশরুম : প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ	ডঃ মনস্বিতা শীল, (ADH, পুরুলিয়া)	১৩-১৪
• মাশরুম চাষে সাফল্য	ডঃ সমরেন্দ্রনাথ খাঁড়া (DDH, সদর দপ্তর)	১৫
• বর্ষার মরশুমে পেঁয়াজ চাষ	ডঃ অনামিকা উপাধ্যায় (ADH, হাওড়া)	১৬-১৭
• সবজির রোগ নিয়ন্ত্রণ—কিছু সহজ প্রতিকার ব্যবস্থা	সুপ্রতীক মৈত্র, (ADH, উত্তর ২৪ পরগনা)	১৮-১৯

মুখ্য সম্পাদক	—	পারমিতা মণ্ডল (বরিষ্ঠ উপসচিব), খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প উদ্যানপালন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ব্যবস্থাপনায়	—	ডঃ সমরেন্দ্রনাথ খাঁড়া (সহ উদ্যানপালন অধিকর্তা, সদর দপ্তর),
গ্রন্থনা ও অঙ্গসজ্জা	—	অমলিনা চক্রবর্তী, অঙ্কিতা সাহা
যোগাযোগ	—	বেনফিস টাওয়ার, জি. এন-৩১ ব্লক, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ magazinefpih@gmail.com (শুধুমাত্র উদ্যাপালন বার্তার জন্য ব্যবহৃত)
ওয়েব সাইট	—	www.wbfpih.gov.in
বিশেষ কৃতজ্ঞতা	—	ডঃ সুব্রত গুপ্ত, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, (খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার) শ্রী দীপ্তেন্দু বেরা, ডাইরেক্টর অফ হর্টিকালচার

জবা ফুল–এক অর্থকরী ফুল

জবা ফুলের ব্যবসায়িক গুরুত্ব আমাদের সবারই জানা। প্রায় প্রতিদিনই এই ফুলের চাহিদা বাজারে দেখা যায়। স্বল্প-উৎপাদন ব্যয়, সন্তুষ্টিজনক উৎপাদন এবং তার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ লাভের পরিমাণ-এই তিনটি বিষয়কে নজরে রাখার কারণেই ফুলচাষীদের মধ্যেও জবাফুল চাষের আগ্রহ রয়েছে। এই প্রতিবেদনে জবা ফুল চাষের খুঁটিনাটি বিষয়ে এমন কিছু তথ্য দেওয়া রইল যেগুলি জবাচাষীদের প্রয়োজনে সহায়ক হয়ে উঠবে।

রোপণ, বৃদ্ধি এবং ফসলকাটার জন্য আদর্শ ঋতু :

রোপণের সময়কাল ঃ শীতকাল ছাড়া সারা বছর রোপণের জন্য আদর্শ কিন্তু বর্ষাকাল (মে-জুলাই) সেরা হিসাবে বিবেচিত হয়।

রোপণ উপাদান ঃ বাণিজ্যিকভাবে কাটিং গুলি রোপণের জন্য ব্যবহার করা হয় তবে কিছু নির্বাচন করা হয় নেমাটোড প্রতিরোধী রুট স্টকের উপর।

মাটি এবং জলবায়ু ঃ ছিদ্রযুক্ত, ভাল নিষ্কাশন এবং উচ্চ জৈব পদার্থ সম্পন্ন দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি জবা চাষের জন্য আদর্শ। সামান্য অম্লীয় মাটি এই চাষের বৃদ্ধির জন্য উপযোগী। ২০-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস হলে জবা চাষের আদর্শ তাপমাত্রা, বৃদ্ধির প্রথম ৫ মাস ছায়াময়পূর্ণ সূর্যালোকের নীচে গাছ ভালোভাবে বেড়ে উঠতে পছন্দ করে, সাধারণত যার সময়সীমা ১২-১৩ ঘণ্টা।

জমি তৈরি ঃ জমির অবাঞ্ছিত উপকরণকে বাদ দিয়ে ২ বার লাঙল চাষ করে, চাষের উপযুক্ত মাটি তৈরি করতে হবে। তারপর ওই জমিতে ৫ টন/একর জৈব সার মিশ্রিত করতে হবে। ২০-৩০ দিনের গর্ত (২' × ২' × ২') খনন করে মাটির সাথে গোবর সার, পাতা সার, হাড়ের খাবার (৫ : ২ : ২ : ১) দিয়ে মিশ্রণ করে চারা রোপণ করতে হবে।

রোপণ ঃ ৩.৫ মিটার × ৩.৫ মিটার দূরত্বে প্রতি একর জমিতে ৩৬০-৪০০ সংখ্যক গাছের চারা রোপণ করতে হবে।

সেচ, আন্তঃচাষ কার্যকলাপ এবং নিষিক্তকরণ ঃ রোপণের পরপরই সেচ শুরু করা উচিত। যত্ন সহকারে চাষের জন্য নতুন রোপণের সময় প্রচুর জল সরবরাহ এবং জমির নিষিক্তকরণের প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন জল দেওয়া, অবাঞ্ছিত রোগাক্রান্ত শাখা ছাঁটাই প্রয়োজন। নতুন করে চারার বৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য আগষ্ট-অক্টোবর মাসের মধ্যে ছাঁটাই করা দরকার। শীতকালে প্রতি গাছে ছাঁটাই এর পর প্রথমে ইউরিয়া : এস.এস.পি : এম.ও.পি @ ৫০ : ১৫০ : ৫০ গ্রাম এবং তার ৪৫ দিন পর আরও ৫০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

জমির বিভাগ ঃ খোলা জমি।

প্রত্যাশিত খরচ ঃ রোপণের সামগ্রী যেমন চারা গাছ, সার, কীটনাশক ইত্যাদির জন্য আনুমানিক খরচ নিম্নরূপ ঃ

উপাদান	একর প্রতি খরচ (টাকা)
মাথাপিছু ৩৬০টি চারা গড়ে ১০ টাকা হিসাবে	৩,৬০০.০০
২৩৭/- টাকা হিসাবে শ্রমিক খরচ মোট ৩০০ দিবস ধরে	৭১,১০০.০০
মোট খরচ	৭৪,৭০০.০০

ফলন ঃ প্রতি মাসে গড় ফলন একর প্রতি ৩৬০০০০টি ফুল।

ঝুঁকি এবং প্রশমন ঃ প্রয়োজনে ছত্রাকনাশক এবং কীটনাশক দিয়ে প্রোফাইল্যাটিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। জবার সাধারণ সমস্যা হল কালো দাগ, ডাই ব্যাক, পাউডারি মিলডিউ, মরিচা, অল্টারনারিয়া ব্লাইট ইত্যাদি। এটি গাছ থেকে সমস্ত আক্রান্ত অংশ নিয়মিত অপসারণ এবং সালফার জাতীয় স্প্রে করার ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। একইভাবে Propiconazol 13.9% E.C (Tilth@ 0.1%), Tabuconazol 50% W. G. (Kalikur 0.1%) ১০-১২ দিনের ব্যবধানে ব্যবহার করা যেতে পারে। কার্বোন্ডাজিম (ব্যাভিস্টিন ০.১%) + ম্যানকোজেব (ডাইথেন এম-৪৫ ০.১%) বা ডিফেনকোনাজল ২৫% ইসি (স্কোর ০.১%) বা অ্যাজোক্সিস্ট্রোবিন ২৫% এস.সি (অ্যামেস্টার ০.১%) বা ক্লোরোথালোনিল (অ্যামস্টার ০.১%) বা ক্লোরোথালোনিল (৫ %, ০.২%) ১০-১২ দিনের ব্যবধানে কালো দাগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর। মূলতঃ এফিডস, থ্রিপস এবং রেড স্পাইডার মাইট জবা গাছের জন্য ক্ষতিকর। এফিডের উপদ্রব নিয়ন্ত্রণের জন্য মিনের তেল ২% এবং তারপরে ডাইমেথোয়েট ৩০ % ই.সি. (রোগের ০.২%) ১৫ দিনের ব্যবধানে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হয়। থ্রিপস ১৫ দিনের ব্যবধানে Imedachloroprid ১৭.৮% E. C. (Simba or Omite ০.২%) বা (Fluphenoxyuron ১০%) স্প্রে করে রেড স্পাইডার মাইট নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সার, ছত্রাকনাশক এবং কীটনাশক ইত্যাদির খরচ (প্রতি একরে)

উপাদান	আনুমানিক খরচ (টাকা)
সার	৩৬,০০০.০০
উদ্ভিদ সুরক্ষা রাসায়নিক (ছত্রাকনাশক + কীটনাশক)	১৫,০০০.০০
মোট	**৫১,০০০.০০**

জবা ফুল চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ

উপাদান	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
জমির প্রস্তুতি	৯০০০/-								
রোপণ উপাদান ঘরচ		৩৬০০/-							
সার+ কীটনাশক	২৫০০০/-	২৫০০/-	২০০০/-	২০০০/-	১৫০০/-	১৫০০/-	১২৫০০/-	২০০০/-	২০০০/-
শ্রম	৬০	৩০	২৫	২৫	২৫	২৫	৪০	৩৫	৩৫
শ্রমিক খরচ	১৪,২২০/-	৭,১১০/-	৫৯২৫/-	৫৯২৫/-	৫৯২৫/-	৫৯২৫/-	৯৪৮০/-	৮২৯৫/-	৮২৯৫/-
সর্বমোট খরচ	৪৮,২২০/-	১২,২১০/-	৭৯২৫/-	৭৯২৫/-	৭৪২৫/-	৭৪২৫/-	২১,৯৮০/-	১০,২৯৫/-	১০,২৯৫/-
ফুল উৎপাদন							৩২০০০০	৩৬০০০০	৩৬০০০০

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ফুল চাষ—এক নজরে

ফুল শুধুমাত্র মানসিক শান্তি প্রদান করে না, পরিবেশের শোভা বৃদ্ধি করে, চাষী ভাইদের ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভও প্রদান করে থাকে। তাই নিম্নে বেশ কিছু এরকম ফুল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল—

গাঁদা ফুল

উচ্চ ফলনশীল জাত : আফ্রিকান : ঠাকুর নগর, শেরাকোল, পুসা নারঙ্গি
চারা বসানোর সময় : আশ্বিন-অগ্রহায়ণ
চারা বসানোর দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৪৫ সেমি., চারা থেকে চারা ৩০ সেমি.
সার প্রয়োগ (বিঘা প্রতি) : মূলসার : ৪ টন গোবর সার, ২৯ কেজি ইউরিয়া, ৭৫ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ১২ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ।
প্রথম চাপান : চারা বসানোর ২১ দিন পর ১৫.৫ কেজি ইউরিয়া, ৫ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ।
দ্বিতীয় চাপান : চারা বসানোর ৫০ দিন পর ১৫.৫ কেজি ইউরিয়া, ৫ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ।
ফসল তোলা : চারা বসানোর ৫০-৬০ দিন পর থেকে ফুল তোলা হয়।
ফলন : বিঘা প্রতি ০.৬ টন-১.২ টন

গোলাপ ফুল

উচ্চ ফলনশীল জাত : মনু পার্লে, ভ্যালেন্সিয়া, ডি লা ফ্রান্স, ইডেন রোড, কুইন এলিজাবেথ, ক্যাথারিনা
চারা বসানোর সময় : আশ্বিন-অগ্রহায়ণ
চারা বসানোর দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৬০ সেমি., চারা থেকে চারা ৪৫ সেমি.
সার প্রয়োগ (বিঘা প্রতি) : মূলসার : ৩-৩.৫ টন গোবর সার, ৪২ কেজি ক্যান সার, ৭৫ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ১৪ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ।
চাপান : চারা বসানোর ৪২ দিন পর ২২ কেজি, ৫ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ
ফসল তোলা : চারা বসানোর ১২০ দিন পর থেকে ফুল তোলা হয়।
ফলন : বিঘা প্রতি ৫৮০০০ ফুলের স্টিক।

বেল ফুল

উচ্চ ফলনশীল জাত : মগরা, গুটি
চারা বসানোর সময় : অগ্রহায়ণ
চারা বসানোর দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৬০ সেমি., চারা থেকে চারা ৪৫ সেমি.
সার প্রয়োগ (বিঘা প্রতি) : মূলসার : ৩.৫-৪ টন গোবর সার, ২২ কেজি ইউরিয়া,৩৪ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ৯ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ।
প্রথম চাপান : ৩০ দিন পর ১২ কেজি ইউরিয়া।
দ্বিতীয় চাপান : ৬০ দিন পর ১২ কেজি ইউরিয়া
ফসল তোলা : চারা বসানোর ১১০-১২০ দিন পর ফসল তোলা হয়।
ফলন : ১৩০ কেজি প্রতি বিঘা।

মরসুমী সূর্যমুখী ফুল

চারা বসানোর সময় : মাঘ-চৈত্র
চারা বসানোর দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৪৫ সেমি., চারা থেকে চারা ৩০ সেমি.
সার প্রয়োগ (বিঘা প্রতি) : মূলসার : ৩-৩.৫ টন পচা গোবর সার, ৩০ কেজি ইউরিয়া, ৪৫ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ১৫ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ।
চাপান : ৩০ দিন পর ১০ কেজি ইউরিয়া
ফসল তোলা : বীজ বোনার ৯০ দিন পর ফসল তোলা হয়।
ফলন : বিঘা প্রতি ৬০,০০০ ফুল।

জুঁই ফুল

উচ্চ ফলনশীল জাত : মগরা, গুটি
চারা বসানোর সময় : অগ্রহায়ণ
চারা বসানোর দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৬০ সেমি., চারা থেকে চারা ৪৫ সেমি.
সার প্রয়োগ (বিঘা প্রতি) : মূলসার : ৩.৫-৪ টন গোবর সার, ২৪ কেজি ইউরিয়া, ৩৪ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ৯ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ।
প্রথম চাপান : ৩০ দিন পর ১২ কেজি ইউরিয়া।
দ্বিতীয় চাপান : ৬০ দিন পর ১২ কেজি ইউরিয়া।
ফসল তোলা : চারা বসানোর ১১০-১২০ দিন পর ফসল তোলা হয়।
ফলন : ১৩০ কেজি প্রতি বিঘা।

গমফ্রেনা (বোতামফুল)

বপনের সময় : আশ্বিন-অগ্রহায়ণ
চারা বসানোর দূরত্ব : সারি থেকে সারি ৩০ সেমি., চারা থেকে চারা ১৫ সেমি.
সার প্রয়োগ (বিঘা প্রতি) : মূলসার : ৩-৩.৫ টন গোবর সার, ২২ কেজি ইউরিয়া, ৪৪ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ১২ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ।
প্রথম চাপান : চারা বসানোর ৩০ দিন পর ২০ কেজি ইউরিয়া
দ্বিতীয় চাপান : চারা বসানোর ৬০ দিন পর ১৫ কেজি ইউরিয়া।
ফসল তোলা : চারা বসানোর ৭০ দিন পর থেকে ফুল তোলা হয়।
ফলন : ১৩০ কেজি প্রতি বিঘা (প্রায়)।

লাভজনক ভাবে হলুদ তরমুজ চাষ

সারা বছর জুড়েই পশ্চিমবঙ্গের আনাচে-কানাচে নানান ধরনের সুস্বাদু ফলের উৎপাদন হয়ে থাকে, যার মধ্যে (গ্রীষ্মকালীন ফল হিসাবে) তরমুজ আপামর বাঙালির হৃদয়ে বিশেষ স্থান অবলম্বন করে আছে। এই ফল গরমে আমাদের শরীর ঠাণ্ডা করে, শরীরে জল ও লবণের ভারসাম্য রক্ষা করে। এছাড়াও তরমুজ হলো পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, প্রোটিন ও নানান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেমন লাইকোপিন, কিউকারবিটাসিন, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি প্রভৃতি পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এমন একটি ফল যা আমাদের শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের পছন্দ, কৌতূহল ও চাহিদা পাল্লা দিয়ে পাল্টাচ্ছে আর সেই সূত্র ধরেই তরমুজের নতুন জাত আমাদের খাদ্য তালিকায় প্রবেশ করেছে। ঘন হলুদ শাঁসের তরমুজের তুলনায় প্রায় ১.৫ থেকে ২.০ গুণ অধিক। হলুদ তরমুজ ও লাল তরমুজের চাষ পদ্ধতির মধ্যে কোনো বিশেষ ফারাক নেই। দুই প্রকার তরমুজই দেখতে যেমন আকর্ষণীয়, স্বাদেও তেমন সুস্বাদু।

মাটি ও জলবায়ু ঃ তরমুজ চাষের জন্য প্রয়োজন শুষ্ক জমি ও ঈষদুষ্ণ আবহাওয়া এবং জলনিকাশীযুক্ত মাঝারি বা মাঝারি উঁচু জমি। তরমুজ বীজের অঙ্কুরোদ্গম হওয়ার জন্য ন্যূনতম তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, উদ্ভিদের প্রাথমিক বিকাশের জন্য তাপমাত্রা ২৫-৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং ফলের বাড় বৃদ্ধির সময়ে তাপমাত্রা ৩০-৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড প্রয়োজন।

জাত ঃ আরোহী, ইয়েলো গোল্ড ৪৮।

জমি তৈরী ঃ চার-পাঁচবার চাষ দিয়ে তরমুজ চাষের জন্য জমি উপযুক্ত করে নিতে হবে। জমি তৈরির পর পিট বা গোলাকার গর্ত তৈরি করে সেই গর্তে সার প্রয়োগের পরে চারা লাগাতে হবে।

চাষের সময় ঃ সাধারণত তরমুজ চাষের আদর্শ সময় হল ফাল্গুনের প্রথমার্ধ থেকে বৈশাখের প্রথমার্ধ। আগাম ফসল পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন করা হয়, সেক্ষেত্রে প্রখর শীতের হাত থেকে চারা রক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

বীজ বপন ঃ

বীজের পরিমাণ	গর্তের আয়তন	সারি থেকে সারি	সারিতে গর্ত থেকে গর্ত
বিঘা প্রতি ১০০ গ্রাম বীজ	৫০ সেমি. প্রশস্ত ও ৩ সেমি. গভীর	২ মিটার	২ মিটার

বীজ বপনের এক থেকে দেড় সপ্তাহ আগে প্রতিটি পিট বা গর্তে পরিমাণ মতো সার মেশাতে হবে, এবং এককেটি গর্তে ৪-৫ টি বীজ বপন করতে হবে। চারা গজানোর পর প্রতি গর্তে ২টি করে চারা রেখে বাকিগুলি তুলে ফেলতে হবে।

চারা রোপণ ঃ বীজের অপচয় রোধ করার জন্য তরমুজ চাষের ক্ষেত্রে চারা রোপণ করাই শ্রেয়, সেক্ষেত্রে ২০ দিন থেকে এক মাস বয়সের ৫-৬ পাতা বিশিষ্ট ১টি করে চারা গর্তে রোপণ করতে হবে।

পরাগায়ন ঃ তরমুজে আলাদাভাবে পুরুষ এবং মহিলা ফুল একই গাছে জন্মায়। পুরুষ ফুলগুলি আকারে ছোট এবং প্রথমে দেখা যায় এবং স্ত্রী ফুলগুলি বড় এবং পরে দেখা যায়। স্ত্রী ফুলের গোড়ায় ছোট ফল থাকে। যদি এটি কুঁচকে যায়, এর মানে কোন পরাগায়ন হবে না। প্রাকৃতিকভাবে, মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করার সময়ে ফুল থেকে ফুলে পরাগ পরিবহন করে। অতএব, তরমুজ ক্ষেতে একটি কৃত্রিম মৌবাক্স স্থাপন করলে পরাগায়নে সুবিধা হয়। প্রতি একর তরমুজ ক্ষেতে একটি মৌবাক্সই যথেষ্ট।

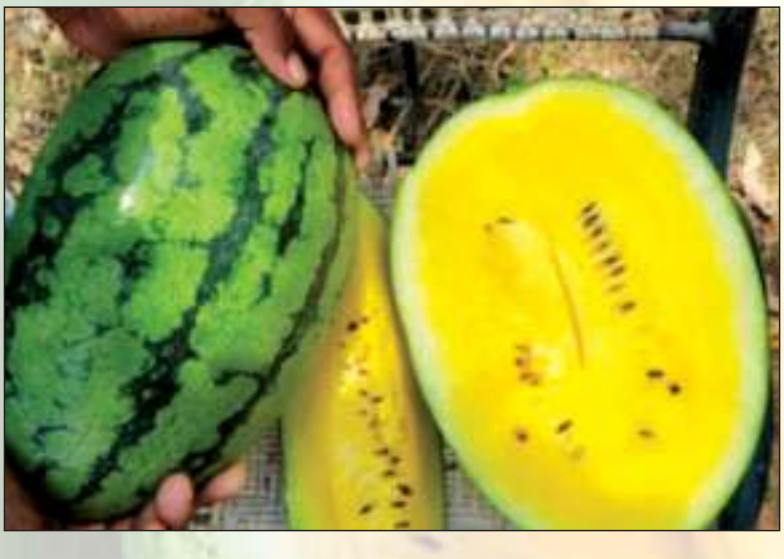

ফসল আবর্তন ঃ বিভিন্ন রোগপোকা জনিত ঝুঁকির কারণে নূন্যতম ৩ বছরের ব্যবধানে একই মাটিতে তরমুজ চাষ করতে হবে। এটি সাধারণত ধান বা অন্যান্য সবজি যেমন টমেটো, লঙ্কা ইত্যাদির সাথে ফসল পরিবর্তন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে চাষ করা উচিত।

সার প্রয়োগ ঃ প্রাথমিক সার হিসাবে ২.৫ টন/বিঘা খামারজাত সার, ৭ কেজি/বিঘা ফসফরাস, ৭ কেজি/বিঘা পটাশিয়াম এবং বীজ বপনের ৩০ দিন পর নাইট্রোজেন ৭ কেজি/বিঘা প্রয়োগ করতে হবে। শেষ চাষের আগে ৩০০ গ্রাম/বিঘা অ্যাজোস্পিরিলাম ও ফসফোব্যাকটেরিয়া এবং ৩০০ গ্রাম/বিঘা সিউডোমোনাস, ৬.৬ কেজি খামারজাত সার এবং ১৩.৩ কেজি নিমখোলের সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

জলসেচ ঃ তরমুজ চাষে, বীজ বপনের দুই দিন আগে, এবং বীজ বপনের পাঁচ দিন পরে সেচ দিতে হবে। সাধারণত, সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সেচ দেওয়া হয়ে থাকে। সেচের সময়ে জলের চাপের দিকে মনোযোগ দিতে হবে যাতে সেটি ফল ফাটার কারণ হয়ে-না দাঁড়ায়। সেচ দেওয়ার সময়ে, গাছের মূল অঞ্চলে জল সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, লতাগুল্ম বা গাছের অন্যান্য অংশ ভেজানো এড়িয়ে চলতে হবে কারণ ভেজা ফুল, ফল বা কাণ্ডে ছত্রাকজনিত রোগের আক্রমণ হতে পারে। ফলের পরিপক্কতার সময়ে সেচ দেওয়া কমাতে হবে এবং ফসল তোলার সময় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে।

রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ ঃ

এফিড বা জাবপোকা ঃ পাতার রস চুষে গাছের ক্ষতি করে, যার ফলে গাছপালা ভিতর থেকে শুকিয়ে যায়। পূর্ণ বয়স্ক লতাগুলির পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং উদ্ভিদ তার শক্তি হারায়।

নিয়ন্ত্রণ ঃ ইমিডাক্লোপ্রিড ১ মিলি প্রতি লিটার জলে অথবা থাইওমিথক্সাম ০.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

সাদা মাছি ঃ নিম্ফ এবং প্রাপ্তবয়স্ক সাদা মাছি, উভয়ের রস চোষার কারণে আক্রান্ত উদ্ভিদ তার জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে, যার ফলে পাতা হলুদ হয়ে যায়, নিচের দিকে কুঁচকে যায় এবং অবশেষে শুকিয়ে যায়।

নিয়ন্ত্রণ ঃ ডাইফেনথিউরন ১.২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে অথবা থাইওমিথক্সাম ০.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

কাণ্ড পচারোগ ঃ এই রোগের ফলে তরমুজের গাছের গোড়ার কাছে কাণ্ড পচে যায় ও গাছ মারা যায়।

নিয়ন্ত্রণ ঃ বীজ বপনের আগে ২ গ্রাম ব্যাভিস্টিন দিয়ে প্রতি কেজি বীজ শোধন করতে হবে। পরবর্তীকালে গাছে রোগ দেখা দিলে ডাইথেন/ইন্ডোফিল এম-৪৫ ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে অথবা ম্যানকোজেব+কার্বোন্ডাজিম ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে ১০-২২ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

ফলন ঃ ১২০ দিনে ৩.৩-৪.০ টন/বিঘা ফল পাওয়া যায়।

ড্রাগন ফল—উপকারী ও অর্থকরী

পশ্চিমবঙ্গে নতুন অর্থকরী চাষযোগ্য ফলের মধ্যে ড্রাগন ফল বাজারে ক্রমশঃ জনপ্রিয় হচ্ছে। এটি একটি ক্যাকটাস গোত্রের গাছ। বিশেষজ্ঞদের মতে ক্যানসার প্রতিরোধে এবং ডায়বেটিক রোগীদের জন্য একটি অতি উত্তম স্বাস্থ্যকর ফল।

প্রধানত তিন ধরনের ড্রাগন ফল দেখা যায় ঃ

- লালশাঁস-লাল ফল (Hylocereus polyrizhus),
- সাদা শাঁস-লাল ফল (Hylocereus usundatus),
- সাদা শাঁস-হলুদ ফল (Hylocerus megalanthus),

বাজারে লালশাঁস যুক্ত ড্রাগন ফলের প্রচুর চাহিদা রয়েছে এবং এগুলি চাষ করে ভালো দাম (২০০-৩০০ প্রতি কেজি টাকা) পাওয়া যায়।

চারা তৈরি ঃ বীজের চারায় মাতৃগাছের সব গুণ থাকে না। সেজন্য কাটিং থেকে তৈরী চারাই বেশি ভালো। কাটিং-এর চারায় দেড় বছরের মধ্যে ফল ধরে। ডাল কাটার পর কার্বোন্ডাজিম বা ম্যানকোজেব প্রতি লিটার ২-৩ গ্রাম মিশিয়ে ডালের কাটা অংশ লাগিয়ে ২-৫ মিনিট শুকিয়ে নিতে হবে।

চারা তৈরির পলিব্যাগ ঃ ১ : ১ অনুপাতে বেলে, দোআঁশ মাটি ও জৈবসার মিশিয়ে তারপর ১ ইঞ্চি খালি রেখে পলিব্যাগে মিশ্রণ ভরতে হবে। এরপর কাটিং চারা পলিব্যাগের মাটিতে ১.৫-২ ইঞ্চি গভীরে পুঁতে দিয়ে ভালোভাবে মাটি চাপা দিতে হবে।

জমি তৈরি ঃ চারা রোপণের ২৫ থেকে ৩০ দিন আগে ৩ মিটার অন্তর ৭৫ সেমি × ৭৫ সেমি × ৭৫ সেমি গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ২৫ কেজি জৈবসার, ৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ এবং ১০ গ্রাম হারে জিপসাম, জিঙ্ক সালফেট ও বোরাক্স মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে।

চারা রোপণের সময় ঃ সারা বছর ধরে চারা লাগানো যেতে পারে। তবে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় হল চারা রোপণের জন্য আদর্শ।

গাছ ছাঁটাই ঃ ফল তোলার পর প্রতিটি গাছে ৪০-৫০টি শাখার ১/২টি প্রশাখা রেখে বাকি ছেঁটে ফেলতে হবে, শাখা কাটার পর ব্লাইটক্স, ডাইথেন এম-৪৫ প্রভৃতি কাটা অংশে লাগাতে ও স্প্রে করতে হবে।

সেচ ঃ ড্রাগন ফলের গাছে তেমন সেচ লাগে না। তবে মাটির রসের অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সেচ অবশ্যই দিতে হবে।

ফসল ঃ ১২-১৮ মাসের মধ্যে গাছে ফল ধরে। এক বছরের একটি গাছ থেকে গড়ে ৫-২০টি ফল পাওয়া যায়। আর একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ থেকে গড়ে ২৫-১০০টি ফল পাওয়া যেতে পারে। একবার গাছ লাগালে ২০-৪০ বছর পর্যন্ত ফল পাওয়া যেতে পারে। এরকম ১ বিঘা জমি থেকে প্রতি বছর ২.৬-৪.০ টন ফলন পাওয়া যায়।

রোগ-পোকার আক্রমণ ও নিয়ন্ত্রণ ঃ গাছে ও ফলে খুব বেশি রোগ-পোকার আক্রমণ হতে দেখা যায় না। তবে অনেক সময় কাণ্ড ও গোড়ায় পচা রোগ হতে দেখা যায়।

কাণ্ড ও গোড়া পচা রোগ ঃ ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া দ্বারা এই রোগ হতে থাকে। আক্রান্ত গাছের কাণ্ড প্রথমে হলুদ ও পরে কালো রং ধরে, পরবর্তীতে ঐ স্থানে পচন শুরু হয় এবং তা বাড়তে থাকে।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত অংশ কেটে, পুড়িয়ে বা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। পরে প্রতি লিটার জলে কার্বেনডাজিম ১.৫ গ্রাম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

বাদামি দাগ ঃ এই রোগের আক্রান্ত গাছের ডগা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। সময়মত রোগ দমন না করলে গাছ শুকিয়ে মারা যায়।

প্রতিকার ঃ কাণ্ডপচা রোগের মতো ড্রাগন ফল গাছে অনেকসময় জাব পোকা ও দয়ে পোকা আক্রমণ করে থাকে। জাব পোকার বাচ্চা বা পূর্ণ পোকা গাছের কচি শাখার রস চুষে খায়। ফলে আক্রান্ত শাখা ও ডগার রং ফ্যাকাসে হয়ে যায়, বৃদ্ধি ও ফলন কমে যায়। এই পোকার শাখার ওপর আঠালো রসের মতো মল ত্যাগ করায় শুঁটি মোল্ড নামক ছত্রাক রোগের সৃষ্টি হয়। ইমিডাক্লোরাপিড প্রতিলিটার জলে ০.৫ মিলি ভালোভাবে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়।

ড্রাগনফল চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ

জমির পরিমাণ ঃ ৫০০ বর্গমিটার

প্রথম বছর ঃ

১.	জমি তৈরির খরচ ২৩৭ টাকা/শ্রম দিবস (৫টি শ্রমদিবস) শ্রমদিবস	১,১৮৫ টাকা
২.	সিমেন্টের পিলার বসানোর জন্য গর্ত খোঁড়ার খরচ ২৩৭টাকা/শ্রমদিবস (১০টি শ্রমদিবস)	২,৩৭০ টাকা
৩.	পিলার বসানোর খরচ ২৩৭ টাকা/শ্রমদিবস (১০টি শ্রমদিবস)	২,৩৭০ টাকা
৪.	চারা লাগানোর গর্ত খোঁড়া ও সার প্রয়োগের খরচ ২৩৭ টাকা/শ্রমদিবস (১০টি শ্রমদিবস)	২,৩৭০ টাকা
৫.	চারা লাগানোর খরচ ২৩৭ টাকা/শ্রমদিবস (৮টি শ্রমদিবস)	১,৮৯৬ টাকা
৬.	অন্তর্বর্তী পরিচর্যা সেচ ও শস্য সুরক্ষার খরচ ২৩৭ টাকা/শ্রমদিবস (৫০টি শ্রমদিবস)	১১,৮৫০ টাকা
মোট ৯৩টি শ্রমদিবস		**২২,০১৪ টাকা**
৭.	চারার খরচ (৪৪০টি) ৪০ টাকা প্রতিটি (১০ %মর্টালিটি হিসাবে)	১৭,৬০০ টাকা
৮.	কেঁচোসার (৪০০ কেজি) ৯ টাকা/কেজি হিসাবে	৩,৬০০ টাকা
৯.	নিমখোল (২০ কেজি) ৭০ টাকা/কেজি হিসাবে	১৪০০ টাকা
১০.	রাসায়নিক সার	১,০০০ টাকা
১১.	শস্য সুরক্ষা	২,০০০ টাকা
১২.	লোহার ফ্রেমসহ সিমেন্টের পিলার (১০০টি) ৬০০ টাকা/পিলার হিসাবে	৬০,০০০ টাকা
১৩.	সাইকেলের পুরনো টায়ার (১০০টি) ২৫ টাকা/প্রতিটি হিসাবে	২,৫০০ টাকা
১৪.	সিমেন্ট, বালি ইত্যাদি	১,০০০ টাকা
১৫.	অন্যান্য	২,০০০ টাকা
মোট খরচ		**১,১৩,১৪১ টাকা**

দ্বিতীয় বছর ঃ

১.	সাইকেলের পুরানো টায়ার (১০০টি) ২৫ টাকা প্রতিটি হিসাবে	২,৫০০ টাকা
২.	জৈব সার (৪০০ কেজি) ৯ টাকা কেজি	৩,৬০০ টাকা
৩.	জৈব শস্য সুরক্ষা	২,০০০ টাকা
৪.	শ্রমদিবস (২৫টি) ২৩৭ টাকা প্রতি শ্রমদিবস হিসাবে	৫,২৯৫ টাকা
	মোট খরচ	**১৪,০২৫ টাকা**

তৃতীয় বছর ঃ

১.	জৈব সার (৪০০ কেজি) ১০ টাকা/কেজি হিসাবে	৪,০০০ টাকা
২.	জৈব শস্য সুরক্ষা	২,০০০ টাকা
৩.	শ্রমদিবস (২৫টি) ২৩৭ টাকা প্রতি শ্রমদিবস হিসাবে	৫,৯২৫ টাকা
	মোট খরচ	**১১,৯২৫ টাকা**

প্রতি বছরের আয় ও ব্যয় ঃ

বছর	চাষের খরচ	সম্ভাব্য উৎপাদন	প্রত্যাশিত আয় ১৫০ টাকা/কেজি
প্রথম	১,১৩,১৪১ টাকা	—	—
দ্বিতীয়	১৪,০২৫ টাকা	২৫০ কেজি	৩৭,৫০০ টাকা
তৃতীয়	১১,৯২৫ টাকা	৩৫০ কেজি	৫২,৫০০ টাকা
চতুর্থ	১১,৯২৫ টাকা	৪০০ কেজি	৬০,০০০ টাকা
পঞ্চম	১১,৯২৫ টাকা	৪০০ কেজি	৬০,০০০ টাকা

মাশরুম ঃ প্রক্রিয়াকরণ সংরক্ষণ

বর্তমান সময়ে মাশরুমকে একটি সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অ্যামিনো অ্যাসিড, অ্যান্টিকোর্সিনোজেন, ফাইবার, ভিটামিন এবং পটাশিয়ামের মতো খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ, মাশরুম একটি স্বাস্থ্যকর খাবার হিসাবে গণ্য করা যায়।

চাষের সহজ পদ্ধতি ও সহজলভ্য কাঁচামালের যোগান বহু চাষী ভাইকে আজ মাশরুম চাষে উৎসাহি করে তুলেছে। এছাড়াও মাশরুমের চাষ তার অর্থকরী দিকটি তুলে ধরায় বর্তমানে এর চাষ ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে।

মাশরুম বিক্রির মূল্য ঃ অয়েস্টার মাশরুম (কাঁচা) ঃ ২০০-৩০০ টাকা/কেজি
অয়েস্টার মাশরুম (শুকনো) ঃ ৯০০-১২০০ টাকা/কেজি

প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা ঃ মাশরুম স্বল্পমেয়াদী হবার দরুণ খুব তাড়াতাড়ি তার সতেজভাব হারিয়ে যায়। তাই মাশরুমকে সতেজ এবং সুদৃশ্য রাখার একমাত্র উপায় প্রক্রিয়াকরণ, যার ফলে মাশরুমের বাজারজাত চাহিদা, মূল্য এবং বৈচিত্র্যকে সবসময় ঊর্ধ্বমুখী এবং অব্যাহত রাখা সম্ভব।

মাশরুম শুষ্ককরণের প্রক্রিয়া ঃ এটি রোদে বা যান্ত্রিক ভাবে শুকানো যায়। রোদে শুকানো সবচেয়ে সস্তা ও জনপ্রিয় পদ্ধতি। মাশরুম যান্ত্রিক উপায়ে দ্রুত শুষ্কতা লাভ করে এবং এটি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রের মাধ্যমে করা সম্ভব যেমন ট্রে শুকানো, ফ্রিজ ড্রাইং, ভ্যাকুয়াম ড্রাইং, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ড্রাইং, এয়ার ড্রাইং ইত্যাদি। শুকানো মাশরুমকে পুনরায় রিহাইড্রেটও করা যায় এবং নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী যেমন—স্যুপ, স্টু, আচার ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যায়।

প্রক্রিয়াজাত পণ্যের বৈচিত্র্য ঃ প্রক্রিয়াজাত মাশরুম আচার, কুকিজ, পাউডার, স্প্রেড, কেচাপ, চিপস, পাঁপড়, পেস্ট, মোম, রোল, পকোড়া, স্যুপ ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

মাশরুমের প্রক্রিয়াকরণে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঃ মাশরুম থেকে বিভিন্ন পণ্য তৈরি করা যেতে পারে। এই জাতীয় প্রক্রিয়াকরণ এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, সেগুলি হল—

(১) সৌর চালিত ড্রায়ার ঃ এই যন্ত্রটি পণ্য থেকে অপ্রয়োজনীয় আর্দ্রতা অপসারণ করে, পাশাপাশি আসল রক্ষ ও স্বাদ বজায় রাখে। এছাড়া, এটি শক্তির সংরক্ষণ ও সাশ্রয় করে, সময় সাশ্রয় করে ও কম স্থান দখল করে, পণ্যের গুনমান বাড়ায়, যার ফলে পরিবেশগত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াটি আরও কার্যকর হয়।

(২) **ফগার বা হিউমিডিফায়ার ঃ** মাশরুম চাষের সাফল্যের জন্য সঠিক সময় ও আর্দ্রতা বজায় রাখা প্রয়োজন। এটি চাষের জন্য ৯০ % আর্দ্রতা প্রয়োজন এবং পিনহেড গঠন ও স্বাস্থ্যকর বিকাশের জন্য উচ্চস্তরের আর্দ্রতা প্রয়োজন। শুষ্ক হলে নিম্নস্তর ফাটল দেখা দেয় যার ফলে ফলন বিঘ্নিত হয়। আবহাওয়া অতিরিক্ত আর্দ্র হলে ব্যাকটেরিয়াল ব্লচ রোগ ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের আক্রমণ বেড়ে যায় ও উৎপাদন কমে যায়।

(৩) **ভ্যাকুয়াম প্যাকেজার ঃ** ভ্যাকুয়াম সিলিং ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। এই পদ্ধতিতে মাশরুমটিকে একটি প্লাস্টিকের ফিল্ম প্যাকেজের রাখা হয় ভেতর থেকে বাতাস অপসারণ করার জন্য এবং প্যাকেজটি সিল করা হয়। এর ফলে মাশরুমের গুনমান বজায় থাকে এবং গ্রাহকের কাছে খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

(৪) **ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রাইন্ডার ঃ** শুকনো মাশরুমকে ডাস্ট/পাউডারে রূপান্তরিত করতে এবং পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণে সক্ষম করতে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

মাশরুম চাষে সাফল্য

শ্রী অশোক পাল হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর ব্লকের বাসিন্দা। পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি খেলাধূলা ও নিজেদের জমিতে অল্প কিছু চাষবাস করতেন। দাদা বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হবার সূত্রে, উদ্যানপালন বিভাগের সঙ্গে অল্প বিস্তর পরিচিত ছিলেন।

২০০৪ সালে দাদার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সহকৃষি অধিকর্তা শ্রী অভিমন্যু বারুই এর সঙ্গে কথা বলেন এবং মাশরুম চাষে আগ্রহী হন। তাঁরই সহযোগিতায় অশোক পাল, চুঁচুড়া থেকে মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এরপর তিনি নিজের উদ্যমে উল্ল বিস্তর মাশরুম চাষ শুরু করেন। ধীরে ধীরে তিনি বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাশরুমের বীজ উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষিত হন এবং ২০০৬ সাল থেকে মাশরুমের বীজ উৎপাদন শুরু করেন।

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি গুণগত দিক থেকে উন্নত মানের মাশরুম উৎপাদন সফল হলেও প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় সেটির বাজারিকরণ। সেই সময়ে মাশরুমকে খাবার হিসাবে গ্রহণ করার মানসিকতা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল না। অশোক বাবু তাতেও দমে না গিয়ে লোকাল ট্রেনে হকারি করে মাশরুম বিক্রি করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু খুব বেশি সাফল্য না পেয়ে শেষ পর্যন্ত এক মার্কেটিং এক্সপার্টের সাহায্য নেন। এরপর তার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন ডাক্তার এবং স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুরোধ করেন যাতে তারা রুগি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাশরুমের গুণগত মান সম্পর্কে অবগত করেন। এরপর স্কুল, অঙ্গনওয়ারি এবং আরও অনেক জায়গাতে তিনি মাশরুম সরবরাহ করতে থাকেন এবং বিভিন্ন স্থানে পরিচিতি লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তরের থেকে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা তাঁকে এই কাজ সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে।

বর্তমানে তিনি নিজের অধীনে আরও অনেক চাষিদের মাশরুম উৎপাদনের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের এই কাজে আগ্রহী করে তুলেছেন। এছাড়া যাদের জায়গার অভাবে মাশরুম উৎপাদনে বাধা পড়েছে তাদের নিজের তৈরি করা মেশিনের সাহায্যে মাশরুমে সিলিন্ডার বিক্রি করে সাহায্য করেছেন।

তিনি বছরে ৫ টন পর্যন্ত মাশরুমের বীজ উৎপাদন করেছেন যার মধ্যে রয়েছে ওয়েস্টার মাশরুম, মিল্কি মাশরুম, বাটন মাশরুম, কিং ওয়েস্টার মাশরুম ইত্যাদি রকমের জাত। এই কাহিনি একজন সাধারণ চাষির, যিনি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা এবং অদম্য জেদের সঙ্গে নিজেকে অসাধারণ এক সফল মাশরুম চাষি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বর্ষার মরশুমে পেঁয়াজ চাষ

দৈনন্দিন জীবনে পেঁয়াজ একটি গুরুত্বপূর্ণ সবজি। পশ্চিমবঙ্গে পেঁয়াজ একটি শীতকালীন সবজি হিসাবে পরিচিত। এই পেঁয়াজ সাধারণভাবে বাজারে আসে মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে। যদিও এই পেঁয়াজ রাজ্যের চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে না পারলেও সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বল্প খরচে সংরক্ষণ করা যায়। সেপ্টেম্বর পরবর্তী সময়ে রাজ্যে পেঁয়াজের ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হয়, যা চলে মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তখন পুরোপুরি তাকিয়ে থাকতে হয় অন্যান্য রাজ্যের দিকে যেখানে বর্ষায় মরশুমে পেঁয়াজ চাষ হয়। ওই সময়ে চাহিদার তুলনায় জোগান কম থাকায় বাজারে পেঁয়াজের দাম আকাশ-ছোঁয়া হয়ে যায়। কিছু জাত আছে যাকে বর্ষার মরশুমে রাজ্যের উঁচু জমিগুলিতে বিশেষ কিছু পেঁয়াজের জাত চাষ করলে ভালো ফলনে চাষির আয়ও যেমন বেড়ে যাবে সাথে সাথে শীতের মরশুমে ফসল তোলা যায়। এর ফলে চাষির আয় যেমন বাড়বে তেমনি রাজ্যের চাহিদাও মিটবে।

জাত ঃ এগ্রিফাউন্ড ডার্ক রেড, এন-৫৩, আর্কা কল্যাণ, আর্কা প্রগতি, আর্কা নিকেতন, বসন্ত ৭৮০ ইত্যাদি।

জলবায়ু ঃ বর্ষার পেঁয়াজের জাতগুলি তুলনামুলকভাবে একটু বেশি তাপমাত্রাতে ভালো হয়। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৮ °-৩৫° এবং ১৪°-১৯° সেলসিয়াস পেঁয়াজের ফলনের পক্ষে সব থেকে বেশি উপযোগী।

মাটি ঃ এঁটেল মাটি ছাড়া অন্য যে কোনো প্রকার মাটিতে এই পেঁয়াজের চাষ করা যায়। পলি ও দোঁয়াশ মাটি পেঁয়াজ চাষের পক্ষে অনুকূল। মাটির অম্ল অম্লত্ব ৫.৮-৬.৫ এর মধ্যে থাকলে ফলন বেশি পাওয়া যায়। পেঁয়াজ কিছুটা লবণাক্ত মাটি সহ্য করতে পারে। পেঁয়াজ লাগানোর আগে জমিকে ভালোভাবে চাষ দিয়ে সমতল করে জল ও বাতাস চলাচলের উপযোগী করে নেওয়া দরকার।

বীজ বপন ও চারা তৈরি ঃ বীজ বপনের উপযুক্ত সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি থেকে আষাঢ় মাসের শেষ পর্যন্ত। বিঘা প্রতি বীজের হার ১.০ কেজি। জল না দাঁড়ানো ও নিকাশি ব্যবস্থা যুক্ত উঁচু জমি বীজতলার (১০ ফুট × ৩ ফুট × ১/২ ফুট) জন্য নির্বাচন করতে হবে। এক বিঘা জমিতে চারা লাগানোর জন্য আনুমানিক এক কাঠা বীজতলার প্রয়োজন হয়। প্রতিটি বীজতলার জন্য ৫০০ গ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট বা ২২৫ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ২৫০ গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাশ দিতে হবে। ২ ইঞ্চি দূরে লাইন করে ১/২ ইঞ্চি গভীরে বীজ বুনতে হবে। তারপর হালকা মাটি বা শুকনো গুঁড়ো জৈব সার দিয়ে বীজকে হালকাভাবে চাপা দিতে হবে এবং শুকনো খড় বা লম্বা ঘাস দিয়ে বীজতলাকে ঢাকা দিয়ে হালকা করে ঝারি করে জল দিয়ে বীজতলা ভিজিয়ে দিতে হবে। বর্ষার প্রকোপ এবং বৃষ্টির হাত থেকে বীজতলাকে রক্ষা করতে হবে। বীজতলায় রোগের প্রকোপ কমাতে তামা ঘটিতে ওষুধ ২-৩ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে ৭-১০ দিন স্প্রে করতে হবে।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ ঃ উঁচু জমি নির্বাচন করা প্রয়োজন। জমিটিকে ভালোভাবে চাষ দিয়ে তাতে ২.৫-৩ টন গোবর সার রাসায়নিক সার মিশিয়ে ১.৪ মিটার অন্তর ৫০ সেমি. চওড়া জল নিকাশি নালা করতে হবে। চারা লাগানোর সময় দুটি সারির মধ্যে দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সেমি.) আর সারিতে দুটি গাছের মধ্যে দূরত্ব ৪ ইঞ্চি (১০ সেমি.) রাখতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ বিঘা প্রতি ২.৫-৩ টন কম্পোস্ট গোবর সার ভালোভাবে মিশিয়ে ২-৩ বার চাষ দিতে হবে। মূল সার হিসাবে বিঘাপ্রতি ৮-১০ কেজি নাইট্রোজেন, ৮-১০ কেজি ফসফরাস, ৭-৮ কেজি পটাশ ও ৫-৬ কেজি সালফার দিতে হবে। চাপান সার হিসাবে বিঘাপ্রতি ৮-১০ কেজি নাইট্রোজেন এবং ৭-৮ কেজি পটাশ দুভাগে চারা

লাগানোর ২১-৪৫ দিন পরে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। অনুখাদ্য হিসেবে জিঙ্ক সালফেট ২.৫ গ্রাম এবং বোরাক্স ১.৫ গ্রাম হিসাবে প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে ৩০ ও ৬০ দিন পরে স্প্রে করতে হবে। বিঘা প্রতি ৩-৩.৫ কেজি কার্বোফিউরান (ফিউরাডন) বা ১.১৫ কেজি ফোরট (থাইমেট) দিলে কীটশত্রুর আক্রমণ হবে না।

আগাছা দমন ঃ হালকাভাবে নিড়ানি দিয়ে আগাছা তুলে ফেলতে হবে যাতে কন্দের কোনো ক্ষতি না হয়। আগাছানাশক ওষুধ হিসাবে অক্সিফ্লুরোফেন ২৩.৫ শতাংশ এ.আই. চারা লাগানোর আগে এবং ৪৫-৬০ দিন পরে হালকাভাবে নিড়ানি দিয়ে আগাছা তুলে ফেলতে পারলে, জমিতে আগাছার সমস্যা যেমন থাকবে না, তেমন ফলনও বেশি পাওয়া যাবে।

জলসেচ ঃ বৃষ্টির অভাব হলে মাটিতে যাতে রস থাকে, সেভাবে সেচের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ফসল তোলার ১০ দিন আগে কোনো সেচ দেওয়া চলবে না।

ফসল তোলা ঃ শীতকালের পেঁয়াজের মতো বর্ষার পেঁয়াজের পাতা তোলার আগে সম্পূর্ণ হয়না হলদে ও শুকিয়ে যায় না। জাত অনুসারে চারা লাগানোর ১১০-১৩০ দিনের মধ্যে ফসল তোলার উপযুক্ত হয়। ফসল তোলার ১৫-২০ দিন আগে ১০ শতাংশ সাধারণ লবণ স্প্রে করলে পেঁয়াজের পাতা নেতিয়ে পড়ে অতিরিক্ত জলীয় অংশ বেরিয়ে যায়। এতে পেঁয়াজের কন্দ তাড়াতাড়ি শুকনো হতে সাহায্য করে এবং কন্দের রং উজ্জ্বল হয়। পেঁয়াজের মধ্যে অতিরিক্ত রস কমানোর জন্য গাছ সমেত কন্দগুলিকে ৩-৫ দিন জমিতে শুকিয়ে নিতে হবে।

ফলন ঃ জাত অনুসারে বিঘাপ্রতি গড় ফলন ২৫-৩০ কুইন্ট্যাল।

এক একর জমিতে বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষে আয়-ব্যয়ের হিসাব

উপাদান	পরিমাণ	খরচ (/-)
বীজ	৩ কেজি = (৩ × ২২০০ প্রতি কেজি)	৬৬০০/-
জৈব সার	২ মেট্রিক টন = (২ × ৬০০ প্রতি মেট্রিক টন)	১২০০/-
রাসায়নিক সার	ইউরিয়া ১০০ কেজি × ৫.৯৪ = ৫৯৪ টাকা, এস.এস.পি. ২৫০ কেজি × ১১ = ২৭৫০ টাকা, এম.ও.পি. ১০০ কেজি × ৩৪ = ৩৪০০ টাকা, অনুখাদ্য (সালফার) ৩ কেজি × ১২০ = ৩৬০ টাকা	৭১০৪/-
জমি তৈরীর খরচ	—	৪৫০০/-
আগাছানাশক	অক্সিফ্লুরোফেন ২৩.৫ শতাংশ ই.সি.-৩০০ মি.লি.	১৫০০/-
রোগপোকা ও কীটশত্রু দমন	—	২৫০০/-
সেচ খরচ	—	১২০০/-
শ্রমিক	৮০ জন শ্রমিক (শ্রমিক খরচ জন পিছু ৩০০ টাকা)	২৪০০০/-
আনুষঙ্গিক খরচ	—	১৫০০/-
মোট খরচ	—	৫০,১০৪/-
উৎপাদন	৮০ কুইন্ট্যাল	
বিক্রয় মূল্য	৮০ কুইন্ট্যাল = (৮০ × ১৫০০ প্রতি কুইন্ট্যাল)	১,২০,০০০/-

সবজির রোগ নিয়ন্ত্রণ—কিছু সহজ প্রতিকার ব্যবস্থা

গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ যে সব সবজিগুলির আমরা দেখতে পাই, যেমন—লাউ, কুমড়ো, শসা, পটল, ঢ্যাঁড়স, পেঁয়াজ-রসুন, ওল-কচু প্রভৃতির বিভিন্ন রোগ ব্যধিজনিত সমস্যা ও প্রতিকার সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেওয়ার প্রচেষ্টা রইল নিচের প্রতিবেদনে—

সবজি ফসল ও তার রোগ	কারণ, প্রকৃতি ও লক্ষণ	প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
শশার তুলো রোগ বা ডাউনি মিলডিউ	• প্রাথমিক অবস্থায় পাতার তলায় সাদা পেঁজা তুলোর মতো ছত্রাক এবং পাতার ওপরের অংশে হলুদ ছোপ দেখা যায়। • অনুকূল পরিবেশে রোগ বৃদ্ধি পেলে পাতার শিরার মাঝখানের হলুদ ছোপ সমস্ত পাতায় ছড়িয়ে পড়ে এবং পাতা ও ডাঁটা শুকিয়ে মরে যায়। • ফল ধারণ ক্ষমতা কমে যায় ও ফলের আকৃতি ছোট হয়ে যায়।	• সেচের জল নিয়ন্ত্রণ করে ম্যানকোজেব এবং মেটালেক্সিল জাতীয় ঔষধ বা ফসিটাইল-এল অথবা সাইমোক্সানিল ম্যানকোজের ১০-১৫ দিন অন্তর ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জন্য জলে ২-৩ বার প্রয়োগ করতে হবে। • এছাড়া আক্রান্ত পাতা ছিঁড়ে ফেলে ম্যানকোজেব ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
ঢ্যাঁড়সের পাতার শিরা হলদে হওয়া বা সাহেব রোগ	• সাদা মাছি-বাহিত ব্যাপক ক্ষতি করা ভাইরাস রোগ। • প্রথমে পাতা শিরা-উপশিরা হলুদ হয়ে পাতা ফ্যাকাসে হয়। • গাছ বসে যায় ও ফলন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	• অবশ্য কর্তব্য ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্ন চাষ ব্যবস্থার সঙ্গে শোষক পোকার সামগ্রিক প্রতিরোধ। • বীজ বোনার সঙ্গে দানা বিষ প্রয়োগ। • বৃদ্ধি ব্যবস্থায় নিমজাত কৃষি বিষ প্রয়োগ। • সাদা মাছি দেখা গেলে কুটে রোগের মতো ব্যবস্থা নিতে হবে।
কুমড়ো জাতীয় সবজির রোগ	• সাদা মাছি ও শোষক-পোকা বাহিত ভাইরাস রোগ। • আক্রান্ত গাছের পাতা ছোট হয়ে যায়। • ফল আসে না, গাছ নষ্ট হয়, ফলন কমে যায়। • কুমড়ো জাতীয় সবজির সর্বাধিক ব্যাপ্ত ছত্রাক-জনিত রোগ • আবহাওয়া নির্ভরশীল রোগ যা বর্ষার আর্দ্রতায় ও শীতের কুয়াশাতে বেশি হয়। • পাতায় হলুদ ছোপ পড়ে বাদামি হয়ে গাছ বসে মারা যায়। • কুমড়োজাতীয় সবজিতে শীতের শেষে ও গ্রীষ্মের গোড়ায় ছত্রাকজনিত রোগ। • সাদা গুঁড়ো ছত্রাক পাতায় পড়ে বাদামি হয়ে যায় আর পাতা ঝরে ফলন কমে।	• নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বীজ নেওয়া। • শোষক পোকার সামগ্রিক প্রতিরোধ। • পরিচ্ছন্ন চাষ ও আগাছা নাশ। • বাকি উপরের মতো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। • ভালো বীজ, পরিচ্ছন্ন চাষ ও আবশ্যিক ব্যবস্থা। • জৈব সারে ট্রাইকোডার্মা প্রয়োগ ও ভালো নিকাশি। • আক্রান্ত পাতা, গাছ তুলে দূরে পুঁতে বিনষ্ট। • পরিচ্ছন্ন চাষ পদ্ধতি ও জলনিকাশি ভালো রাখা। • থায়াফেনেট মিথাইল ১ গ্রাম বা ট্রাইডিমর্ফ ১ মিলি/লিটার জলে গুলে স্প্রে।

পটলের ডাঁটা, ফল-পচা ও পাতার হাজা রোগ	• বর্ষাকালে আর্দ্রতায় ছত্রাকজনিত এই রোগের আক্রমণ হয়। • পাতায় বাদামি পচা/হাজা রোগ। • ডাঁটা পচে ও পরে ফল পচে ফলনে ব্যাপক ক্ষতি হয়।	• উত্তম জল নিকাশি ব্যবস্থা ও মাচাতে পটল চাষ বিশেষত বর্ষাকালে। • জমিতে ট্রাইকোডার্মা প্রয়োগ ও লাগানোতে লতা/মূল শোধন। • রোগ আক্রমণে কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম ও হাইড্রোক্সাইড ২.৫ গ্রাম বা মেটালাক্সিল ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম বা অ্যাকক্সিস্ট্রবিন ২ মি.লি./লি জলে স্টিকার দিয়ে স্প্রে।
লাউ এর মোজাইক বা কুটে রোগ	• পাতায় হলুদ-সবুজের নক্সা পড়ে এবং ক্রমশ পাতা হলুদ হয় • আক্রান্ত গাছের পাতা ক্রমশঃ ছোট হয়। • আক্রান্ত লতায় ফুল আসে না। • ফলে বিকৃতি ঘটে এবং ফলের গায়ে হলুদ ও ধূসর ও সবুজের নক্সা দেখা যায়। • ফল আয়তনে ছোট হয় ও ফলন কমে যায়	• নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে অথবা সুস্থ সবল নীরোগ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। • দু-একটা লতাতে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে, সেই লতা তুলে ফেলে শিরাবাহি কীটনাশক যেমন ডাইমিথোয়েট (১.৫ মিল/লিটার) অথবা ইমিডাক্লোরপিড (৩.৫ মিলি/১০ লিটার) স্প্রে করতে হবে। • জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে হবে এবং এই জাতীয় সবজির জমির চারধারে জোয়ার অথবা ভুট্টা লাগাতে হবে।
পেঁয়াজ ও রসুনের পাতায় দাগ ধসা রোগ	• শীতের শেষে গরম বাড়লে ছত্রাক আক্রমণে পাতায় ও কলিতে ডিম্বাকার দাগ বড় হয়ে গাছ শুকিয়ে যায়। • পাতায়, কলিতে হালকা কমলা/হলুদ দাগ ও পরে কলি শুকিয়ে নষ্ট হয়।	• পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে ভালো বীজ ও জমিতে ট্রাইকোডার্মা। • রোগের আক্রমণে ক্লোরোথ্যালোলিন ২ গ্রাম বা ডাইফেনকোনাজোল ১.৫ গ্রাম বা প্রোপিকোনাজোল ১ মি.লি. বা অ্যাজক্সিস্ট্রবিন ১ মি.লি./লিটারে স্টিকার দিয়ে স্প্রে।
ওল ও কচুর গোড়া পচা রোগ	• বর্ষাকালে কাণ্ড ও কন্দের সংযোগে বাদামি কালচে দাগ পড়ে পচে। • ডাঁটার গোড়া আলগা হয় ও টানলে উঠে আসে। • পাতায় প্রথমে ছোট গোলাকার দাগ শুকিয়ে হলুদ/কমলা হয়। • পরে মাঝে ফুটো হয়ে চারদিকে হলুদ আভা থাকে।	• রোগমুক্ত বীজ কন্দের সঙ্গে কন্দ ছত্রাক নাশক দিয়ে শোধন করে লাগানো। • মাটি আলগা করে কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম বা হাইড্রোক্সাইড ২.৫ গ্রাম/লি/জলে গুলে/২/৩ বার স্প্রে। • মেটালাক্সিল+ম্যানকোজেব বা সাইমকসানিল+ম্যানকোজেব ২-২.৫ গ্রাম/লি. জলে আঠা দিয়ে স্প্রে।

Department of Food Processing Industries & Horticulture
Government of West Bengal
Benfish Tower / 4th Floor / Salt Lake City / Sector - V / Kolkata - 700091
visit us at Website ; wbfpih.gov.in
Printed by : Basumati Corporation Ltd., Kolkata -700 012